

মান্টোর গল্প: তোবা টেক সিং

লিখেছেন সুমাত্রী (তারিখ: বিস্ময়, ১৭/০৫/২০১২ - ৫:৫৭ পূর্বাহ্ন)

ক্যাটেগরি: গল্প অনুবাদ সাহিত্য তোবা টেক সিং সাদাত হাসান মান্টো



উর্দু সাহিত্যের শক্তিমান ছোটগল্পকার সাদাত হাসান মান্টোর জন্মশতবার্ষিকী চলে গেল ১১ই মে। এই ক্ষণজন্মা, মানুষের পক্ষে থাকা অমর গল্পকারের বেশ পরিচিত একটি গল্প তোবা টেক সিং। মূলত দেশ ভাগ নিয়ে রূপকধর্মী গল্প এটি। ইংরেজী থেকে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা করা হল এখানে। মান্টোকে নিয়ে গুগলে বিস্তারিত অনেক কিছুই জানা যাবে, তাই ওদিকে আর গেলাম না।

তোবা টেক সিং
সাদাত হাসান মান্টো

১৯৪৭ এর দেশবিভাগের দুই কি তিন বছর পর, হঠাৎ কী জানি কী খেয়াল হল ভারত আর পাকিস্তান সরকারের, ঠিক হল যেভাবে অপরাধীদের এদেশ থেকে ওদেশে স্থানান্তর করা হয়েছিল ঠিক তেমন করেই বিনিময় করা হবে দু'দেশের মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের। ভারতের মুসলিম পাগলদের পাঠানো হবে পাকিস্তানে আর পাকিস্তানি পাগলাগারদের হিন্দু-শিখ পাগলদের হস্তান্তর করা হবে ভারতের কাছে। এহেন প্রস্তাবের আদৌ কোন গুরুত্ব ছিল কিনা বলাটা মুশ্কিল। যাহোক, দুপক্ষের উঁচুপর্যায় থেকেই সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছিল। উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে একটা দিন ধার্য করা হল পাগলদের স্থানান্তরের জন্য। মোটামুটি দুপক্ষই সম্মত হল যে যেসব মুসলিমদের ভারতে পরিবার রয়ে গেছে তাদের ভারতে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে আর বাদবাকী সবাইকে সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেয়া হবে। যেহেতু প্রায় অধিকাংশ হিন্দু আর শিখই পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল, অমুসলিম পাগলদের পাকিস্তানে রাখার ব্যাপারে তাই কোন প্রশ্ন উঠেনি। সবাইকেই ভারতে নিয়ে যাওয়াটাই তাই স্থির হল।

ভারতে এই ঘটনার জের কী হল তা কেউ জানলনা, কিন্তু খবরটা পাকিস্তানে, বিশেষ করে লাহোরের পাগলাগারদে বেশ শোরগোল তুলল যার ফলে উদ্ভূত হয়েছিল মজার কিছু পরিস্থিতির। এক মুসলিম পাগল, যে কিনা রোজ পড়ত জ্বালাময়ী উর্দু পত্রিকা 'দৈনিক জমিদার', পাকিস্তান কী এটা জিজ্ঞেস করায় একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, "এটাও জাননা? পাকিস্তান হল ভারতের একটা জায়গা যেটি গলা-কাটার ক্ষুর তৈরীর জন্য খুব বিখ্যাত।" উত্তরে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে বন্ধুটি তাকে আর কোন প্রশ্ন করলনা।

একই রকম ভাবে, এক শিখ পাগল আরেক শিখকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা সর্দারজি, আমাদের ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন এরা? আমরা তো ওদের ভাষাটাও জানিনা।" বিজ্ঞের মত হেসে সর্দারজি বলল, "আমি কিন্তু হিন্দোস্তোরাজ ভাষাটা জানি, হারামী ইন্ডিয়ানগুলো, হাঁটে এমনভাবে যেন তারা রাজা-উজিরা।"

একদিন গোসল করার সময় এক মুসলিম পাগল এমন তারস্বরে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" বলে চিৎকার করে উঠে যে সে পিছলে গিয়ে মেঝেতে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

পাগলাগারদের সবাই যে পাগল ছিল অমন নয়। কয়েকটা দাগী খুনীও ছিল তাদের মধ্যে। ফাঁসীর রশি থেকে এদের বাঁচানোর জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা কর্মকর্তাদের ভাল-মতন ঘুষ দিয়ে তাদের এখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। ভারত বিভাগ কিংবা পাকিস্তান আসলে কী এসব নিয়ে তাদের কেবল ভাসা ভাসা কিছু ধারণা ছিল মাত্র। হালের পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা পুরোপুরিই অজ্ঞ ছিল। পত্রিকাগুলোতে বলতে গেলে কোন সত্যি খবরই পাওয়া যেতনা আর পাগলাগারদের কর্মচারীরা ছিল অশিক্ষিত যাদের আলাপচারিতা থেকে তারা কোন কিছুর আভাসও পেতনা। এই লোকগুলো শুধু যা জানত তা হল কায়েদে আজম নামের এক লোক মুসলিমদের জন্য একটা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছে যার নাম পাকিস্তান। কিন্তু এই পাকিস্তান যে ঠিক কোথায় এ নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিলনা। আর এ কারণেই তারা ঠিক এই মুহূর্তে ভারতে না পাকিস্তানে আছে এ বিষয়টি নিয়ে ধন্ধে পড়ে গেল। যদি তাদের অবস্থান ভারতের মধ্যে হয়ে থাকে তবে পাকিস্তানটা কোন জায়গায়? আর যদি তারা এখন পাকিস্তানের ভাগে পড়ে, তবে এ কীকরে সম্ভব যে একটু আগেও তারা ভারতে ছিল? কীকরেই বা একটু আগে তারা ভারতের ছিল, আর কীকরেই বা হঠাৎ করে তারা পাকিস্তানের হয়ে গেল?

এই ভারত-পাকিস্তান-পাকিস্তান-ভারতের অর্থহীন শব্দ-শব্দ খেলায় এক পাগল এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে একদিন মেঝে ঝাড়ু দেয়ার সময় সে একটা গাছে চড়ে বসল এবং একটা ডালে বসে দুই ঘন্টা ধরে নীচের লোকগুলোকে ভারত-পাকিস্তানের স্পর্শকাতর সমস্যাগুলো সম্পর্কে উত্তেজিতভাবে বোঝাতে লাগল। যখন

প্রহরীরা তাকে নেমে আসার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, সে আরও আরও উঁচুতে উঠে গিয়ে বলল, "আমি ভারতে বা পাকিস্তানে কোথাও থাকতে চাইনা। এইখানে, গাছের ঠিক এই জায়গাটাতে আমি আমার ঘর বানিয়ে থাকব।"

এইসব হট্টগোল এক এমএসসি ডিগ্রিধারী শান্তিশিষ্ট মুসলিম রেডিও-ইঞ্জিনিয়ারকে, যিনি কিনা আপনমনে দীর্ঘপথ হেঁটে বেড়াতেন, বেশ বিচলিত করে তুলল। একদিন তিনি তার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে উদ্যম হয়ে গেলেন, তারপর জামা-কাপড়গুলো সব এক প্রহরীকে দিয়ে বাগানের ভেতরে ঐরকম অবস্থাতেই দাঁড়াতে লাগলেন।

চিনিয়টের আরেকজন মুসলিম উন্মাদ, কদিন আগেও যে কিনা একজন ঘোরতর মুসলিম লীগার ছিল আর দিনে পনের-ষোলবার গোসল করত, হঠাৎ করেই গোসল করা বন্ধ করে দিল। যেহেতু তার নাম ছিল মোহাম্মদ আলী, একদিন সে ঘোষণা করে বসল যে সে আসলে অন্য কেউ না, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহই। তারই পথ অনুসরণ করে এক শিখ একদিন বলে বসল, সে হল শিখদের মহান নেতা মাস্টার তারা সিং। ব্যাপারটা হয়ত একটা ভয়াবহ সংঘর্ষের দিকেই এগিয়ে যেত। কিন্তু কোনরকম ক্ষতি হওয়ার আগেই এই পাগল দুটোকে বিপদজনক ঘোষণা করা হল আর আলাদা দুটো সেলে বন্দী করে রাখা হল।

পাগলাগারদের উন্মাদদের মধ্যে লাহোরের এক হিন্দু আইনজীবী ছিল যিনি প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি জানলেন যে অমৃতসর, যেখানে তার প্রেমিকাটির বাস, ভারতে পড়েছে তখন তিনি খুব দুঃখ পেলেন। হিন্দু আর মুসলিম সব নেতারা যারা ষড়যন্ত্র করে ভারতবর্ষকে দুইভাগ করেছে আর সেই সাথে তার প্রেমিকাকে ভারতীয় আর তাকে পাকিস্তানি বানিয়েছে, তিনি সেইসব নেতাদের বাবা-মায়ের নামে বিশ্রী গালাগাল দিলেন। যখন উন্মাদ বিনিময়ের এই কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন তার পাগল বন্ধুরা তাকে উৎফুল্ল হতে বলল যেহেতু এখন তিনি ভারতে যেতে পারবেন। কিন্তু এই তরুণ আইনজীবীটি লাহোর ছেড়ে যেতে চাইলনা, কারণ অমৃতসরে তার আইনব্যবসার পসার নিয়ে তার মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

পাগলাগারদের ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে দুজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিল। যখন তাদের জানানো হল যে ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষ থেকে পাততারাি গুটাচ্ছে, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে লাগল যে সব সমস্যার তাদের সম্মুখীন হতে হবে সেসব নিয়ে। যেমন, ইউরোপিয়ান ওয়ার্ড কি নির্মূল করে দেয়া হবে? তারা কি সকালের নাশতা পাবে তখন? রুটির বদলে তাদের কি ভারতীয় একদম ক্ষুদ্রাকৃতির চাপাতি দিয়েই চালাতে হবে? তাদের মাঝে একজন শিখ ছিল যাকে এই পাগলাগারদে পনের বছর আগে ভর্তি করানো হয়েছিল। যখনই সে কোন কথা বলত, সেটা ছিল দূর্বোধ্য রহস্যময় শব্দমালা-"গুড়গুড়ের উপর দখলকরা ধ্যান খাড়ি লালটেইন এর মুগডাল।" প্রহরীরা বলত যে সে এই পনের বছরে কখনও দুচোখের পাতা বন্ধ করেনি। এমনকি সে বিশ্রাম নেবার জন্য শোয়ও নি কোনদিন। এই অব্যাহত দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তার পাগুলো ফুলে গিয়েছিল আর পায়ের গোড়ালীর মাংশপেশির মাঝখানটা চুপসে গিয়েছিল, কিন্তু এরকম যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে কখনও শোয়ার ব্যাপারটা নিয়ে গা করেনি। মুঞ্চচিন্তে খুব মনোযোগ দিয়ে সে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এই উন্মাদ বিনিময়ের সব আলোচনা শুনত। কেউ যদি এ ব্যাপারে তার মত জানতে চাইত, সে গলায় একটা বেশ ভারিঙ্কি ভাব এনে বলত, "-গুড়গুড়ের উপর দখলকরা ধ্যান খাড়ি পাকিস্তান সরকারের মুগডাল।" কিন্তু পরে সে পাকিস্তান সরকারের জায়গায় বলত শুধু 'তোবাক টেক সিং' যেটি ছিল তার নিজের শহরের নাম। তখন সে জিজ্ঞেস করতে লাগল তোবাক টেক সিং কোন পক্ষে পড়বে। কিন্তু কাউকেই মনে হলনা যে এই প্রশ্নের উত্তর জানে। যারা ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল তারা নিজেরাই আর একটা ধাঁধার পাঁকে আটকে যেতে লাগল। শিয়ালকোট আগে ছিল ভারতের, এখন হয়ে গেছে পাকিস্তানের। ঠিক একইভাবে, মনে হল লাহোর, যেটি আগে ছিল পাকিস্তানের, এখন হাত বদল হয়ে যাবে ভারতের। হয়ত পুরো ভারতবর্ষটাই হয়ে যাবে পাকিস্তান। সবগুলো ব্যাপার ছিল এমনই বিভ্রান্তিকর! আর কেই বা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে ভারত কিংবা পাকিস্তান দুটো দেশই পৃথিবীর বুক থেকে একদিন একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবেনা?

সিংজির পাগলাটে মাথার চুল কমে গিয়েছিল, দাড়ি হয়ে এসেছিল ধূসর বর্ণের, যার কারণে তাকে দেখাত বুনো আর হিংস্র। কিন্তু আদতে তিনি ছিলেন একেবারেই নিরীহ। পনের বছরে একবারের জন্যও কারো সাথে তার ঝগড়া হয়নি। পাগলাগারদের পুরোনো কর্মচারীরা জানত যে একসময় তিনি ছিলেন বেশ ধনী, তোবা টেক সিং এ তার ছিল দোনকে দোন জমি। তারপর হঠাৎ করেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তার পরিবার তাকে শিকলে বেঁধে এই পাগলাগারদে নিয়ে আসে আর এখানেই রেখে চলে যায়। মাসে একবার তারা তাকে দেখতে আসত কিন্তু যখন থেকেই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল, তখন থেকে তার আত্মীয়রা তাকে দেখতে আসা বন্ধ করে দিল।

তার নাম ছিল ভীষণ সিং কিন্তু সবাই তাকে ডাকত তোবা টেক সিং নামে। তার জানা ছিলনা আজ কী বার, এটা কোন মাস কিংবা কতগুলো বছর তিনি এই পাগলাগারদে পার করেছেন। তবুও যেন সহজাতভাবেই তিনি জানতেন ঠিক কোনদিন তার আত্মীয়রা তাকে দেখতে আসবেন আর সেদিন তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে গোসল করতেন, সাবান দিয়ে সারা শরীর ভাল করে ডলতেন, চুলে তেল দিতেন, আঁচরাতেন এবং পরিষ্কার কাপড়

পরতেন। যদি তার আত্মীয়রা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করত, তিনি চুপ করে থাকতেন অথবা চিৎকার করে বলতেন, “গুড়গুড়ের উপর দখলকরা ধ্যান খাড়ি লালটেইন এর মুগডাল।”

যখন তাকে পাগলাগারদে নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি ঘরে রেখে এসেছিলেন এক ছোট শিশুকন্যা। এখন সে পনের বছরের এক সুন্দরী তরুণী যাকে ভীষণ সিং চিনতে পারেননা। মেয়েটি তাকে দেখতে আসলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারত না।

যখন ভারত-পাকিস্তানের ভাগাভাগির ঝামেলাটা শুরু হয় ভীষণ সিং তার পাগল সাথীদের কাছে প্রায়ই তোবা টেক সিং কোথায় পড়েছে তা জানতে চাইত। কেউ তাকে কোন উত্তর দিতে পারতনা। আর এখনতো দর্শনার্থীদের আসাটাও বন্ধ হয়ে গেছে। আগে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলে দিত ঠিক কখন দর্শনার্থীরা আসবে। কিন্তু এখন আর তিনি বুঝতে পারেননা। তার ভেতরের কণ্ঠস্বরটা যেন হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি পরিবারের সবার অভাবটা খুব টের পাচ্ছিলেন, তারা যে উপহারগুলো তার জন্য নিয়ে আসত, তার জন্য তারা যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করত এগুলোর জন্য তার খুব প্রাণ পুড়ছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তার পরিবারের লোকেরা ঠিকই তাকে বলতে পারত তোবা টেক সিং ভারতে না পাকিস্তানে পড়েছে। তার এমনও মনে হচ্ছিল যে তারা হয়ত তোবা টেক সিং এর তার পুরোনো বাড়ি থেকেই আসত।

উন্মাদদের একজন নিজেকে একদিন ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করল। একদিন ভীষণ সিং তাকে জিজ্ঞেস করল তোবা টেক সিং কোথায়। তার অভ্যাসমত বিকট এক অট্টহাসি দিয়ে উন্মাদেশ্বর প্রথমে ভীষণ সিংকে অভিবাদন জানাল, তারপর বলল, “তোবা টেক সিং ভারত বা পাকিস্তান কোনখানেই না। আসলে এটা কোথাও না কারণ আমি এখনও এটার অবস্থান এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিইনি।”

ভীষণ সিং নিজেকে ঈশ্বর ঘোষণা করা এই লোকটাকে অনুরোধ করল সে যেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সমস্যাটার একটা সুরাহা করে। কিন্তু ঈশ্বরকে মনে হল তিনি অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে খুব ব্যস্ত। অবশেষে ভীষণ সিং এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, “গুড়গুড়ের উপর দখলকরা ধ্যান খাড়ি গুরুজি ডা খালসা আর গুরুজির ফতেহ ও যে বলে সে নিহাল সৎ শ্রী আকাল।” আসলে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল, “তুমি আমার আর্জির উত্তর দিচ্ছনা কারণ তুমি আসলে একটা মুসলিম ঈশ্বর। যদি তুমি একটা শিখ ঈশ্বর হতে, তুমি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করতে।”

উন্মাদ বিনিময়ের নির্ধারিত তারিখটির কয়েকদিন আগে, তোবা টেক সিং এর একজন মুসলিম যিনি ভীষণ সিং এর বন্ধু ছিলেন পাগলাগারদে এলেন তার সাথে দেখা করতে। এর আগে তিনি কখনই ভীষণ সিং এর সাথে দেখা করতে আসেননি। তাঁকে দেখেই ভীষণ সিং একদিকে সটকে পড়তে চাইলেন কিন্তু একজন রক্ষী তার পথ আগলে দাঁড়াল। সে বলল, “আপনি কি আপনার দোস্ত ফজল দীনকে চিনতে পারছেন না? উনি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।” ভীষণ সিং ফজল দীনের দিকে চোরা চোখে একবার চাইলেন, তারপর বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াতে লাগলেন। ফজল দীন ভীষণ সিং এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, “অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমাকে একবার দেখে আসি, কিন্তু সময় করতে পারছিলাম না। তোমার বাড়ির সবাই ভাল আছে, ওরা ভালভাবেই ভারতে গিয়ে পৌঁছেছে। আমার যতটুকু সাধ্য ছিল তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি। আর তোমার মেয়ে, রূপ কাউর” এতটুকু বলে ফজল দীন একটু ইতস্তত করছিলেন, তারপর বললেন, “সেও ভারতে ভাল আছে, নিরাপদে আছে।”

ভীষণ সিং কোন কথাই বললেন না। ফজল দীন বলে গেলেন, “তোমার পরিবার আমার কাছে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে তুমি ভাল আছ। শীঘ্রই তুমিও ভারতে চলে যাবে। তখন মেহেরবানি করে ভাই বলবীর সিং, ভাই রঘুবীর সিং আর বোন অমৃত কাউরকে আমার সালাম জানিয়ে। ভাই বলবীরকে বল যে ফজল দীন ভাল আছে। যে দুটি বাদামী মহিষ তিনি রেখে গিয়েছিলেন তারাও ভাল আছে। মহিষ দুটোই বাছুর প্রসব করেছে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে একটা বাছুর মরে গেছে। বল যে আমি প্রায়ই তাদের কথা মনে করি আর তাদের বল আমায় লিখে জানাতে যদি আমার তরফ থেকে কোনকিছু করার থাকে।”

এরপর বললেন, “এই নাও, তোমার জন্য কিছু বড়ই নিয়ে এসেছিলাম। ভীষণ সিং ফজল দীনের কাছ থেকে উপহারটুকু নিয়ে গার্ডের হাতে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “তোবা টেক সিং কোথায়?”

“কোথায় আবার, এখানেই, যেখানে এটি সবসময় ছিল।”

“ভারতে না পাকিস্তানে?”

“ভারতেও না পাকিস্তানেও না।”

এরপর আর একটা শব্দও না বলে ভীষণ সিং অন্যদিকে হেঁটে চলে গেলেন, যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, “গুড়গুড়ের উপর দখলকরা ধ্যান খাড়ি পাকিস্তান আর ভারতের দূর ফিতে মূনের মুগডাল।”

অবশেষে উন্মাদ বিনিময়ের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল। এদেশ থেকে ওদেশে দুদেশের যে সমস্ত পাগলকে স্থানান্তর করা হবে তাদের তালিকা পাঠানো হল আর তারিখ নির্ধারণ করা হল।

এক শীতের সন্ধ্যায় লাহোরের পাগলা গারদ থেকে পুলিশ প্রহরায় হিন্দু আর শিখ পাগলদের ট্রাকে করে

সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই বিনিময় পর্ব সুনিশ্চিত করতে সাথে গেল। ওয়াগা সীমান্তের চেক-পোস্টে দুই পক্ষের মোলাকাত হল, নথিপত্র স্বাক্ষরিত হল আর পাগল-বিনিময় পর্ব শুরু হল। পাগলদের ট্রাক থেকে নামানো আর অপর পক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়ার কাজটা সহজ ছিলনা মোটেও। কয়েকজন ট্রাক থেকে নামতে অসম্মতি জানাল। যাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নামানো গেল তারা ট্রাক থেকে নেমেই এদিকে ওদিকে দৌঁড়াদৌড়ি শুরু করল। কেউ কেউ একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেল। তাদের কাপড় চোপড় পরিয়ে দেয়া মাত্রই তারা সেগুলো আবার ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। তারা গালাগাল দিতে লাগল, গান গাইতে থাকল আর একে অপরের সাথে মারামারি করতে লাগল। অন্যরা কান্না জুড়ে দিল। মহিলা পাগলেরা, যাদেরও বিনিময় করা হচ্ছিল, অন্যদের চেয়েও বেশী চাঁচামেচি করছিল। এক বিশ্রী হট্টগোলে পরিনত হল জায়গাটা। তীব্র ঠাণ্ডায় সবার দাঁত ঠকঠক করে শব্দ করছিল।

অধিকাংশ উন্মাদকেই এই পুরো ব্যাপারটার ঘোরতর বিরোধী বলে মনে হল। তারা কিছুতেই বুঝতে পারছিলনা তাদের কেন জোর করে একটা অচেনা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আর 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' এর শ্লোগান উঠছিল চারদিকে। শুধুমাত্র সময়মত হস্তক্ষেপের কারণেই বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভবপর হয়েছিল।

রেজিস্ট্রারে ব্যক্তিগত বিবরণ নথিবদ্ধ করার জন্য যখন ভীষণ সিং এর পালা এল, তখন তিনি ওখানের এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোবা টেক সিং কোথায় পড়ল হে? ভারতে নাকি পাকিস্তানে?"

একচোট হেসে ঐ কর্মকর্তা বলল, "পাকিস্তানে, আর কোথায় পড়বে!"

এটা শুনে ভীষণ সিং ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তার সঙ্গীদের সাথে যোগ দিতে দৌঁড় দিলেন। পাকিস্তানী রক্ষীরা তাকে ধরে ফেলল আর চেষ্টা করল তাকে ভারতের দিকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে। কিন্তু ভীষণ সিং একচুলও নড়লেননা। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এটা তোবা টেক সিং। গুড়গুড়ের উপর দখলকরা ধ্যান খাড়ি তোবা টেক সিং আর পাকিস্তানের মুগডাল।"

তাকে বারবার বোঝানো হল যে তোবা টেক সিং এখন ভারতের অংশ, অথবা খুব শীঘ্রই ভারতের হয়ে যাবে, কিন্তু এই বোঝানোতে কোন লাভ হলনা। তারা এমনকি তাকে টেনে-হঁচড়ে সীমানার ওধারে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু তাও করা গেলনা। ঐখানেই ভীষণ সিং তার ফোলা পা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন যেন পৃথিবীর কোন শক্তিরই সাধ্য নেই যে তাকে ঐখান থেকে সরায়। যেহেতু তিনি ছিল নিরীহ এক বৃদ্ধ, শীঘ্রই অফিসারেরা তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঠিক সূর্যোদয়ের আগে ভীষণ সিং ভয়াবহ একটা আত্ননাদ করে উঠলেন। সবাই যখন ছুটে গেল সেদিকে তারা দেখল যে লোকটা বিগত পনের বছর ধরে সোজা দাঁড়িয়ে ছিল সে এখন মাটিতে মুখ খুবরে পড়ে আছে। কাঁটাতারের পেছনে একদিকে একসাথে দাঁড়িয়ে ছিল ভারতের উন্মাদেরা আর আরেকদিকে আরো অনেক কাঁটাতারের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল পাকিস্তানের উন্মাদেরা। মাঝখানে একটুকরো নামহীন জমিনের উপর মুখ খুবরে পড়ে ছিল তোবা টেক সিং।

সূত্রঃ <http://www.sacw.net/partition/tobateksingh.html>